লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়ি
গণহত্যা

তপন পালিত

১৯৭১
গণহত্যা ও নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন সিদ্দিকী

প্রকাশকাল
পৌষ ১৪২১/ডিসেম্বর ২০১৪

লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা
[Lalmatia, Jainpur & Khajanchibari Genocide]

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture Archive & Museum Trust]
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
[Bangladesh Historty Congress]

প্রকাশক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০
itihassammilani.bd@gmail.com, archivemuseum1971@gmail.com
০১৮১৬২৮৮৬৭৪, ০১৭১৫৪৫৭৩৮২, ০১৭১১২১৭১১১

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

পরিবেশক
সুবর্ণ
জার্নিম্যান

গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ
তারিক সুজাত

মূল্য : ১০০ টাকা

ISBN : 978-984-33-8462-1

ন্যাশনাল ফাইন্যান্স লিমিটেড প্রদত্ত অধ্যাপক কবীর চৌধুরী অনুদানের সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষকে হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন একটি দেশে এত অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি, নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যার কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসীবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনি ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতা-বিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র

উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনধর্মী হলেও পুরো কাজটি গবেষণামূলক। উল্লেখ্য, গণহত্যায় সব শহীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রতিটি গণহত্যায় যে কজনের নাম পাওয়া গেছে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে অনেক আলোকচিত্র/শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয়েছে যা নেয়া হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ছবি যেহেতু জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে জন্য কখনও কেউ আপত্তি তোলেননি। শিল্পী ও আলোকচিত্রিদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমির স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– সেই অশ্রু- শোণিতের দিনগুলিকে অন্তরে অনুভব করে তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা পুস্তিকায় সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার কুচাই ইউনিয়নের লালমাটিয়া ও বরইকান্দি ইউনিয়নের জৈনপুর গ্রাম এবং সিলেট শহরের নয়াসড়কের খাজাঞ্চি বাড়িতে সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতন ও বধ্যভূমির বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক তপন পালিত। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি এ কাজে গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধূর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সারা বাংলাদেশের মতো সিলেটেও ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ সুরমা উপজেলার লালমাটিয়া, জৈনপুর এবং নয়াসড়কের খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা অন্যতম।

দক্ষিণ সুরমা উপজেলাটির দূরত্ব সিলেট শহর থেকে মাত্র ৯ কি. মি.। ২৫ মার্চ সারা দেশে গণহত্যা শুরু হলে তার কিছুদিন পর পাকিস্তানি সৈন্যরা সিলেট শহরের খুব কাছে নির্জন স্থান সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ রোডে রেললাইনের পাশে লালমাটিয়াতে একটি ক্যাম্প স্থাপন করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ফিশারির লাল জীপে করে প্রায় প্রতিদিন ৫-৬ জন লোককে হাত ও চোখ বেঁধে নিয়ে আসা হতো। তারপর তাদের হত্যা করে সৈন্যরা চলে যেত। ক্যাম্পে থাকা পাকিস্তানি সৈন্যরা লাশ মাটিচাপা দেবার ব্যবস্থা করতো। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এখানে সহস্রাধিক লোককে হত্যা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর সেই বধ্যভূমি থেকে অনেক হাড় ও মাথার খুলি উদ্ধার করা হয়।

লালমাটিয়ার খুব কাছেই জৈনপুর গ্রাম। দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বরইকান্দি ইউনিয়নের অন্তর্গত এই জৈনপুর গ্রামেও পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা চালায়। সকলের নাম পরিচয় জানা না গেলেও ৪জনের নাম পরিচয় জানা যায়। এপ্রিল মাসে লালমাটিয়াতে ক্যাম্প স্থাপনের পর পাকিস্তানি সৈন্যরা আশেপাশের বাড়িগুলিতে লুটপাট চালায়। বিশেষ করে হিন্দু বাড়িতে তাদের আক্রমণ ছিল বেশি। তাদের আক্রমণ ও নির্যাতনের ভয়ে গ্রামের অধিকাংশ লোক বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু যারা বাড়ি থেকে পালাতে পারেননি তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছেন। এটি জৈনপুর গণহত্যা নামে পরিচিত।

সিলেট শহরের নয়াসড়কে অবস্থিত খাজাঞ্চি বাড়িতে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে যে গণহত্যা সংঘটিত হয় তা খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা নামে পরিচিত। নয়াসড়কে এই বাড়িতে বর্তমানে খাজাঞ্চি বাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। খাজাঞ্চি বাড়িটি পাকিস্তান আমলে ছিল ইপিআর ক্যাম্প। এটি জমিদার বাড়ি। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা এই খাজাঞ্চি বাড়িতে গণহত্যা চালিয়ে অনেককে হত্যা করে। তাদের মধ্যে ছিলেন একই পরিবারের ৫জন। এরপর স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় ব্যাপক লুটপাট চালায়।

এই পুস্তিকায় তিনটি গণহত্যার উপর পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই গণহত্যাগুলোর ইতিহাস যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে উঠে আসেনি। সিলেট জেলার গণহত্যা নিয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাজুল মোহাম্মদের *সিলেটে গণহত্যা* অন্যতম। গ্রন্থটিতে লালমাটিয়া বধ্যভূমি এবং খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু জৈনপুর গণহত্যা সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ দ্বিতীয় খণ্ডে* সারা দেশে ৯০৫টি বধ্যভূমি শনাক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে লালমাটিয়া ও খাজাঞ্চি বাড়ি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলেও জৈনপুর গণহত্যা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সিলেট থেকে প্রকাশিত *সাগ্নিক* পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় কান্তি দেব লালমাটিয়া বধ্যভূমি ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো তাঁর *বিস্মৃতির আড়ালে সিলেটের গণহত্যা* গ্রন্থে জৈনপুর গণহত্যাকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি মাসিক *সাগ্নিক* পত্রিকায় এই গণহত্যা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা লাভের ৪৪ বছর পরও এই গণহত্যা ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলোকে চিহ্নিত করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নতুন প্রজন্ম এই বধ্যভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলোর ভয়াবহ ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা প্রতিনিয়ত এই স্থান দিয়ে আসা যাওয়া করলেও এই স্থানগুলো তাদের মনে কোন রেখাপাত করে না। আমাদের সেই ব্যর্থতার দায় থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত হওয়ার জন্য এই তিনটি স্থানে গণহত্যা সম্পর্কে মাঠপর্যায়ে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা করি। এই তথ্যসংগ্রহের কাজে আমাকে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে সঞ্জয় কান্তি দেব, অসীম কুমার দেব, পার্থ সারথী কর, লাল মিয়া, মইন উদ্দিন আহমদ, আবুল কাসেম, রিচার্ড দত্ত ও বিশাল পুরকায়স্তের নাম উল্লেখযোগ্য। সঞ্জয় কান্তি দেবের *বিস্মৃতির আড়ালে সিলেটের গণহত্যা* গ্রন্থটি পড়ে এই স্থানগুলো নিয়ে আমার কাজ করার আগ্রহ জন্মে। তিনি অসুস্থ শরীর নিয়েও আমাকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেন। অসীম কুমার দেব সার্বক্ষণিকভাবে গবেষণা কাজের জন্য তথ্যসংগ্রহের পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের ছবি তোলা ও তাদের ভাষ্য রেকর্ড করতে সাহায্য করেন। এছাড়া যাকে ছাড়া এই গবেষণা কাজ সম্পন্ন হতো না তিনি গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ষাটঘরের লাল মিয়া। তিনিই প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে

কথা বলার ব্যবস্থা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এই লাল মিয়ার খোঁজ দেন মইন উদ্দিন আহমদ। তার কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুনতাসীর মামুনের কাছে যাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই কাজ শুরু করি। তিনি পাশে বসিয়ে নিজ হাতে গবেষণা ও সম্পাদনার কাজ শিখিয়েছেন। গণহত্যার এই ইতিবৃত্ত সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে যদি মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই এ কাজের সার্থকতা।

২০ অগ্রহায়ণ ১৪২১

তপন পালিত
tapan133@hotmail.com

ভৌগোলিক অবস্থান

লালমাটিয়া ও জৈনপুর গণহত্যার স্থান দুটি সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার অন্তর্গত। দক্ষিণ সুরমা সিলেট জেলার একটি নতুন উপজেলা। এই উপজেলাটি সিলেট শহর সংলগ্ন। দক্ষিণ সুরমা উপজেলার উত্তরে সিলেট সদর উপজেলা, দক্ষিণে ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে গোলাপগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে বিশ্বনাথ উপজেলা অবস্থিত। ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ সুরমা থানা গঠিত হয়। ২০০৫ সালের ২৯ জানুয়ারি সিলেট সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন হতে ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে দক্ষিণ সুরমা থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১১ সালের ৩০ জুন মোল্লারগাঁও ও তেতলী ইউনিয়নের অংশ বিশেষ নিয়ে কামালবাজার ইউনয়ন গঠন করা হয়। বর্তমানে মোল্লারগাঁও, বরইকান্দি, তেতলী, কুচাই, সিলাম, লালাবাজার, জালালপুর, মোগলাবাজার, দাউদপুর ও কামালবাজার এই ১০ টি ইউনিয়ন নিয়ে দক্ষিণ সুরমা উপজেলাটি গঠিত। সিলেট শহর থেকে এই উপজেলাটির দূরত্ব ০৯ কি. মি.। এর আয়তন প্রায় ১৯৪.১৭ বর্গ কি.মি.।

দক্ষিণ সুরমা বলতে সাধারণত সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরকে বোঝায়। এই উপজেলাটির কিছু অংশ শহরের মধ্যেই পড়ে। সিলেট সদর থানার অর্ধেক ইউনিয়ন দক্ষিণ সুরমার অন্তর্গত। বর্তমানে এই উপজেলা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত। সিলেট জেলা হতে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করার কারণে এই উপজেলার ৪ নং কুচাই ইউনিয়নে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ডিআইজি সিলেট রেঞ্জ এর কার্যালয়, সিলেট শিক্ষাবোর্ড ভবন, কারিগরি মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের দপ্তর এই উপজেলায় অবস্থিত।

উপজেলার শিক্ষার হার ৫৯.১৪% যার মধ্যে পুরুষ ৬৩.০৯% এবং মহিলা ৫৪.৬১%। মোট জনসংখ্যা ১৮৮৬৭৫ (পুরুষ ৯৭১১৩ এবং মহিলা ৯১৫৬২) জন। জনসংখ্যার ১৮১০০০ জন মুসলিম, ৭৬৫৩ জন হিন্দু এবং ২২ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মানচিত্র

সৌজন্যে বাংলা পিডিয়া

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

দক্ষিণ সুরমা উপজেলার পাশ দিয়ে সুরমা নদী প্রবাহিত। কদমতলী পয়েন্ট থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ যাবার পথে শিববাড়ি বাজার পার হয়ে কিছু দূর যাবার পর পাওয়া যাবে লালমাটিয়া বধ্যভূমিটি। ১৯৭১ সালে সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ রাস্তাটি ছিল কাঁচা। কদমতলী থেকে শিববাড়ি বাজারের ভিতর দিয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ যাবার পথে কিছুদূর এগোলে রাস্তার ডান পাশে বরইকান্দি ইউনিয়ন এবং বাম পাশে কুচাই ইউনিয়ন। লালমাটিয়া বধ্যভূমিটি কুচাই এবং জৈনপুর গ্রামটি বা গণহত্যার স্থানটি বরইকান্দি ইউনিয়নের অন্তর্গত। বরইকান্দি ইউনিয়নের উত্তরপশ্চিম পাশে মোল্লারগাঁও এবং দক্ষিণপাশে তেতলী ইউনিয়ন। ঢাকা-সিলেট রেল লাইনটি মোল্লারগাঁও ও বরইকান্দি ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ রাস্তার বাম পাশে কুচাই ইউনিয়নের দক্ষিণ দিকের ভরারু বিলের পাশে লালমাটিয়া বধ্যভূমি অবস্থিত। এই স্থানটি সাধুকোনা এবং বাঘমারা নামে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালে এখানে বহু লোককে হত্যা করা হলে এর মাটি লাল হয়ে যায়। এরপর থেকে এই স্থানটি লালমাটিয়া নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

জৈনপুর গ্রামটি দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বরইকান্দি ইউনিয়নের অন্তর্গত। এই গ্রামটিতে ধানের জমি বেশি। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। অনেকে তখন সরকারি চাকুরিতেও নিয়োজিত ছিলেন। গ্রামের পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। গ্রামের রাস্তাগুলো ছিল কাঁচা। পাকিস্তানি সৈন্যরা ধানের জমির আইল বা বাঁধ ধরে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে গিয়ে লুটপাট ও হত্যা চালায়।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ

মুক্তিযুদ্ধের সময় কুচাই ও বরইকান্দি ইউনিয়ন শহরের কাছেই থাকার কারণে কিছুটা উন্নত ছিল। অধিকাংশ বসত বাড়ি ছিল টিনের তৈরি। কয়েকটি দালান বাড়িও ছিল। এই অঞ্চলে হাওর, বিল এবং নদী হতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। লালমাটিয়া বধ্যভূমি হাওরের পাশে থাকার কারণে মানুষ হাওরে ধান কাটতে গেলে তাদের ধরে জোর করে তাদের দিয়ে গর্ত করানো হতো। সেই গর্তে মৃতদেহ কবর দেয়া হতো। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী।

গণহত্যার পটভূমি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে শুরু হয় রাও ফরমান আলী প্রণীত এবং ইয়াহিয়া-হামিদ-টিক্কা খানের গৃহীত অপারেশন সার্চ লাইট। সিলেট শহরে প্রবেশের পর সৈন্যরা শহরের কয়েকটি স্থানে সাধারণ মানুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ২৬ মার্চ ভোরে নাইওরপুলে রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে ব্যারিকেড তৈরিরত অবস্থায় একদল যুবকের উপর গুলি করে। গুলিতে ঘটনাস্থলেই আবদুস সামাদ (ফকির) নামে একজন শহীদ হন। বাকি সবাই পালিয়ে প্রাণরক্ষা করে। শহরে প্রবেশ করে সৈন্যরা কারফিউ জারি করে। পাকিস্তানি সৈন্যরা দরগা গেটের সামনে চন্দনটুলার বাসিন্দা রিক্সাচালক জোলাইশাহকে গুলি করে হত্যা করে। সিলেটে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা খাদিমনগর, আদিত্যপুর, বুরুঙ্গা, ভাটপাড়া, গালিমপুর, হরিকোনা, উমরপুর, হাওয়াপাড়া, নয়াসড়ক খাজাঞ্চি বাড়ি, জৈনপুর, লালমাটিয়া প্রভৃতি স্থানে গণহত্যা চালায়।

৮ এপ্রিল সিলেট শহর পাকিস্তানি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। প্রথম দিন তারা হত্যা করে আবদুল হামিদ চৌধুরী, আবদুল লতিফ, সাইদুর রহমান, সইয়ব আলী ও রজিদ আলীসহ আরো অনেককে। ১৩ এপ্রিল সিলেট শহরের পুরনো লেনের কানচন্দ্র দেবের বাড়িতে তাঁকেসহ বিজয়কুমার দত্ত, প্রীতিশচন্দ্র দে এবং মুকুলচন্দ্র দে কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই দিনই পাকিস্তানি সৈন্যরা খাঁ পাড়ার দালাল ওয়াহিদ উল্লাহ, সরাফত উল্লাহ এবং আবদুস সালাম সিলেটের অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স সুপারভাইজার জিতেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে কুপিয়ে হত্যা করে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা সিলেট শহরে প্রবেশ করে তাদের গণহত্যার পাশাপাশি কিছু নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমি স্থাপন করে। তারা শহরের আশেপাশের নির্জন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে সেখানে গণহত্যা চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় তারা সিলেট শহরের কাছেই দক্ষিণ সুরমা উপজেলায় প্রবেশ করে মার্চের শেষের দিকে।

মুক্তিযুদ্ধে দক্ষিণ সুরমার জনগণ গৌরবময় ভুমিকা পালন করেন। ন্যাপ নেতা আবদুল হামিদ, আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজউদ্দিন আহমদ, ডা. কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ, তরিক উল্লা, নজির উদ্দিন আহমেদ, শহীদ সুলেমান আহমদ, রফিকুল হক, রেজওয়ান উদ্দিন, সুবল পাল স্থানীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ২৯ মার্চ দক্ষিণ সুরমার

একটি প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি প্রবেশ করে সংহতিবিরোধীদের খুঁজতে থাকে। খোঁজারখলার তজমুল আলী ছিলেন একজন ঠিকাদার। তিনি পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তবে স্থানীয় প্রতিরোধ ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিজের গাড়ি নিয়ে ঘর থেকে বের হন। কিন্তু পালাতে পারেননি। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে এবং গাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। সিরাজুল ইসলাম নামে ১৪ বছরের এক কিশোরকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে। কিশোর শহীদ সিরাজের স্মৃতিতে দক্ষিণ সুরমায় গড়ে উঠেছে 'সিরাজ স্মৃতি পরিষদ'।

বর্তমানে দক্ষিণ সুরমার কদমতলি বাস টার্মিনালটিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করে। বিভিন্ন স্থান থেকে বাসে করে প্রচুর লোক ধরে আনতো তারা। এমনও হয়েছে নিরীহ বাসযাত্রীরা নামার পর পাকিস্তানিরা তাদের আটক করে নিয়ে গেছে নদীর তীরে। তারপর গুলি করে হত্যা করে অজানা সব মানুষের লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে সুরমার অথৈ জলে।

যুদ্ধ শুরু হলে সিলেট মোগলা বাজার রুটের লালমাটিয়ায় জোয়াদ মিয়া নামে এক ব্যক্তির যাত্রী বোঝাই বাসে পাকিস্তানি বোমারু বিমান শেলিং করলে বাসটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে অনেকে হতাহত হন। তাদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা যায়। একজন হলেন মোগলা বাজার জাহানপুরের মুহিবুর রহমান (বাবু মিয়া) এবং সিলামভাঙ্গির করমদর আলী মাস্টার। প্রত্যক্ষদর্শী গোটাটিকর ষাট ঘরের বাসিন্দা লাল মিয়া জানান, যখন পাকিস্তানি বোমারু বিমান আসে তখন সবাই বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশে ব্রিজের নীচে অবস্থান নেন। একজন আত্মরক্ষার জন্য গাড়ির নিচে লুকিয়ে থাকেন। এতে শেলের আঘাতে তার মৃত্যু হয়। অন্যজন গাড়িতে থাকা অবস্থাতেই মারা যান। জোয়াদ মিয়া যুদ্ধ শুরু হলে নিজের বাসটি রক্ষার জন্য কদমতলী থেকে মোগলাবাজারে নিজ বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাই যাত্রী নিয়ে মোগলাবাজারের দিকে রওয়ানা দেন। তখনই যাত্রীবাহী বাসে এই বিমান হামলাটি হয়। দক্ষিণ সুরমার গোটাটিকরে পাকিস্তানিদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের পর একজন মুক্তিযোদ্ধাকে আশ্রয় দেয়ার কারণে পাকিস্তানি বাহিনী রাহেলা বেগম নামে একজনকে গুলি করে হত্যা করে।

পাকিস্তানি বাহিনী ৩১ মার্চ দক্ষিণ সুরমার গোটাটিকরে প্রবেশ করে। এসময়ে তারা প্রায় প্রতিদিনই গোটাটিকরে আসা যাওয়া করতো এবং বেশ ক'জনকে হত্যা করে। ৩১ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী গোটাটিকরের নমশূদ্র পাড়া, যা বর্তমানে ছিটাগোটিকর নামে পরিচিত সেখানে প্রবেশ করে। তাদের প্রবেশের আগে অনেকেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি

বাহিনী ৫ জনকে ধরে এনে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করে গুলি করে। গুলি করার সাথে সাথে বীরেন্দ্র নমশূদ্র ও সুরেন্দ্র নমশূদ্র মারা যান। নরেন্দ্র নমশূদ্রের কাঁধের পাশ দিয়ে বুলেট প্রবেশ করে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। দিগেন্দ্র নমশূদ্রও গুলিবিদ্ধ হন। রাখালনাথ নামে অন্য একজন গুলি করার পূর্বেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান। এরপর তারা তিনজন মরার ভান করে মাটিতে পড়ে থাকেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে গেলে তারা প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হন।

পাকিস্তানি বাহিনী ১ এপ্রিল গোটাটিকরে হত্যা করে দুজনকে। এরা দুজনই ছিলেন সিএন্ডবির ওভারসিয়ার। শারীরিকভাবে নির্যাতন করে ব্যাংঙ্কার রবীন্দ্রকুমার গুণ, পৌরসভার কর্মচারী আবদুল বাছিত এবং পিডব্লিউর ওভারসিয়ার আবদুল মতিনসহ আরো অনেককে। প্রবীণ বামপন্থী নেতা আবদুল হামিদকে সার্কিট হাউসে ১১ দিন আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। গোটাটিকর এলাকায় পাকিস্তানি বোমারু বিমানের সেলিংয়ে একটি বেবিট্যাক্সির চালক ও যাত্রীসহ ৬ জন মারা যান। পাকিস্তানি বাহিনী ও দালাল মকই একদিন গোটাটিকরের বরদা মোহান্তের স্ত্রীকে তুলে নিতে যায়। বরদার ভাই তাদেরকে বাধা দিলে তাকে হত্যা করা হয়। এরপর রাজাকার মকই বরদার স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যায়।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

২৬ মার্চ ভোর থেকেই সিলেটে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল মাসে তারা সিলেট শহর থেকে ৯ কিমি দূরে দক্ষিণ সুরমা উপজেলার লালমাটিয়াতে ক্যাম্প স্থাপন করে। শিববাড়ি বাজার থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ রোড ধরে কিছুদূর গেলেই লালমাটিয়া বধ্যভূমি অবস্থিত। এই স্থানটি পূর্বে সাধু কোনা মোড় বা বাঘ মারা নামে পরিচিত ছিল। স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এতলোককে এখানে হত্যা করা হয়েছে যে তাদের রক্তে সেখানকার মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল। এরপর থেকে এই স্থানটি লালমাটিয়া নামে পরিচিত। এখানে ক্যাম্প স্থাপনের একটি কারণ রয়েছে। মোগলাবাজারের জোয়াদ মিয়া নামে এক ব্যক্তি একটি নতুন বাস কিনেন। যুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে তিনি বাসটি কদমতলী থেকে মোগলাবাজারে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেন। খালি বাস দেখে মানুষ সেটাতে চড়ে বসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসটি ভরে যায়। তিনি বাস বোঝাই যাত্রী নিয়ে কদমতলী ফেঞ্চুগঞ্জ রোডে রওয়ানা দিয়ে শিববাড়ি পাড় হয়ে লালমাটিয়াতে গেলে পাকিস্তানি দুইটি ফাইটার বিমান দুই দিক থেকে দুটি শেল নিক্ষেপ করে। এঅবস্থায় যাত্রীরা বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশের ব্রীজের নীচে আশ্রয় নেয়।

পাকিস্তানি সৈন্যরা পরবর্তীকালে এই বাসটিকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার ডানপাশে রেললাইন ও মাটির সড়কের মাঝামাঝিতে ফেলে দিয়ে সেই গাড়িতেই ক্যাম্প স্থাপন করে। রাস্তার দুই পাশেই তাদের ক্যাম্প ছিল। তবে তারা যাদেরকে ধরে নিয়ে আসত তাদের সবাইকে রাস্তার ডান পাশে অর্থাৎ রাস্তার পশ্চিম পাশে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হত। প্রায় ১ মাইল জায়গা জুড়ে রাস্তার পাশ ঘেঁষে গর্ত করে মানুষকে হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হত।

লালমাটিয়া ক্যাম্পে পাকিস্তানি সৈন্যদের ৫-৬ জন, মাঝে মাঝে তার চেয়ে বেশিও থাকতো। তারা রাতে স্থানীয়দের মাধ্যমে পালাক্রমে ক্যাম্প পাহারা দেবার ব্যবস্থা করে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কুচাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান চাঁন মিয়া। তিনিই ঠিক করে দিতেন কারা কখন এবং কবে ক্যাম্প পাহারা দিবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের পাহারা দেবার সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে বলতো যাতে মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করলে তাদের সবাইকে এক সাথে হত্যা করতে না পারে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রায় প্রতিদিনই ফিশারির লাল জীপে করে ৫-৬ জন লোককে চোখ ও হাত পিছনে বেঁধে নিয়ে আসতো। এরপর তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে নিচে নামিয়ে গুলি করে লাথি দিয়ে ফেলে দিত। এরপর যারা ক্যাম্পে থাকতো তারা এদের মাটিচাপা দেবার ব্যবস্থা করতো। মাঠে কাজ করতে আসা স্থানীয় লোকদের ধরে এনে তাদের দিয়ে গর্ত ভরাট করাতো এবং পরের দিনের জন্য গর্ত করে রাখতে বাধ্য করত। দিনে দুই তিনবারও জীপ আসতো। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান লাল জীপ দেখলেই তারা বুঝতে পারতেন যে এদেরকে হত্যা করতে নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর গুলির শব্দ শুনে তারা বুঝে নিতেন কতজনকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতিটি গর্তে ৬-৭ জন এমনকি ১০-১২ জনকেও মাটিচাপা দেয়া হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শী লাল মিয়া জানান।

গণহত্যার বিবরণ দিয়ে লাল মিয়া বলেন, সেই দিন একজন জীবন্ত মানুষকে আমি মাটিচাপা দিয়েছি। সেই লোকটি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও মরেনি। যখন আমি গুলিবিদ্ধ লোকটিকে মাটিচাপা দিচ্ছিলাম তখন সে আমাকে কাতর কণ্ঠে বলে, ভাই আমি মরিনি, আমাকে মাটিচাপা দিবেন না। কিন্তু যেহেতু আমার পিছনে পাকিস্তানি সৈন্যরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল তাই বাধ্য হয়ে আমি তাকে মাটিচাপা দেই। প্রায় প্রতিদিন জীপে করে ৫-৬ জন মানুষ নিয়ে আসা হতো। এবং গুলির শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারতাম যে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা বাড়ির

পিছনে লুকিয়ে থেকে দেখতাম। অনেক সময় পাকিস্তানিরা যাদের নিয়ে আসতো তাদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে দৌড়াতে বলতো এবং দৌড় দিলে পিছন থেকে গুলি করে তাদের হত্যা করা হতো। তাদের হত্যার পর স্থানীয় লোকরা যারা হাওরে কাজ করতে যেত তাদের দিয়ে বাধ্য করে লাশ মাটিচাপা দেবার ব্যবস্থা করতো।

ক্যাম্পে থাকা সৈন্যরা আশেপাশের বাড়িতে লুটপাট করতো। লুটপাটে তাদের সহায়তা করেন ষাটঘরের বাসিন্দা আব্দুল্লাহ। পাকিস্তানি সৈন্যরা লালমাটিয়াতে ক্যাম্প করার পর আব্দুল্লাহ তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। স্থানীয়রা জানান সে উর্দুতে পারদর্শী ছিল। তাই খুব সহজেই তাদের কাছে চলে যেতে পেরেছে। সে ক্যাম্পে সৈন্যদের জন্য রুটি তৈরি করতো। পাকিস্তানি সেনাদের কাজ করে দিয়ে ধীরে ধীরে সে প্রভাশালী হয়ে উঠে। লালমাটিয়ার পাশে হাওরে আব্দুল্লাহর কিছু জায়গা ছিল। সেই জায়গার পাশে ছিল পৈত্যপাড়ার হিন্দু কয়েকজনের জায়গা। আব্দুল্লাহ সে জায়গা দখলে নেয়ার জন্য পাকিস্তানিদের খেদমত করে বলে ষাটঘরের বাসিন্দা জহুরউদ্দিন জানান। আব্দুল্লাহ গিতেশ মাস্টার নামে একজনকে বাধ্য করে তাদের হিসাবপত্র লেখার দায়িত্ব দেয়।

আব্দুল্লাহ গ্রামের সবাইকে বলে দেয় যাতে কেউ রাতে ঘরে বাতি না জ্বালায়। বাতি দেখলেই সৈন্যরা সে বাড়িতে চলে আসতো। সৈন্যরা আশেপাশের বাড়ি লুট করে অনেককে ধরে এনে ক্যাম্পে নির্যাতন করতো। এবং জানা যায় যে, কয়েকজন স্থানীয় লোককেও এখানে হত্যা করা হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়ে কেউ সেখানে যেত না তাই তাদের পক্ষে কারও নাম ঠিকানা জানা সম্ভব হয়নি। এমনও হয়েছে যে, গুলি করার পর মারা যায়নি কিন্তু তাকে জোর করে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

লালমাটিয়া গণহত্যার ঘটনাটি ষাটঘরের বাসিন্দা বিশেষ করে যারা সেই সময়ে সাহস করে বাড়িতে ছিলেন তারা ষাটঘর মসজিদের পিছনে লুকিয়ে দেখতেন। লালমাটিয়াতে ক্যাম্প করার পর আশেপাশের হিন্দু বাড়িগুলোতে আক্রমণ ও লুটপাট হয়েছে বেশি এবং কয়েকজন নারী ধর্ষণের কথাও জানা যায়। অনেকে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে মোগলাবাজারসহ আশেপাশের গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তারা বাড়িঘর দেখার জন্য আসতেন। তাদেরকেও ধরে এনে গর্ত খুড়তে এবং লাশ মাটিচাপা দিতে বাধ্য করা হতো। স্বাধীনতা লাভের পর লালমাটিয়ায় অনেক মানুষের কঙ্কাল ও অস্থি পাওয়া যায়।

গণহত্যা-নির্যাতনকারীর পরিচয়

সিলেটে পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে গণহত্যায় নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে সরফরাজ খান, কর্ণেল সরফরাজ মালিক, ক্যাপ্টেন নুরুদ্দিন খান ও বিগ্রেডিয়ার ইফতেখার রানার নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সৈন্যরা একাত্তরে সিলেট জেলায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ, জাতিগত নিধন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। সিলেটের সালুটিকর বিমানবন্দরের নিকটবর্তী মডেল স্কুলটিকে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসররা গোটা ন'মাস বধ্যভূমি ও নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। অমানুষিক অত্যাচারের পর স্কুল প্রাঙ্গণেই নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হতো। স্কুলের বিভিন্ন কক্ষেও অজ্ঞাত পরিচয় নারী ও পুরুষের লাশ পাওয়া যায়। সিলেট শহরের ভিতরে সিভিল সার্জনের বাংলো বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হত। পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই বাংলোতে হত্যার পর লাশগুলোকে তারা কবর না দিয়ে বিভিন্ন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিত। তাদের সাথে এদেশিয় রাজাকার আলবদর ও শান্তি কমিটির সদস্যরা সাহায্য করে। তবে এদের সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি।

লালমাটিয়া নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমিতে পাকিস্তানিদের সাথে সাহায্য করে রাজাকার আব্দুল্লাহ, রইদ খাঁ প্রমুখ। বর্তমানে তারা মৃত।

অন্যদিকে জৈনপুর গণহত্যায় সহায়তা করে জৈনপুর গ্রামের স্থানীয় রাজাকার পাখী মিয়া, কটু মিয়া, হারিছ মিয়া, বারিক মিয়া এবং পাঠান পাড়ার এনাম খান। মুক্তিযুদ্ধের পর এদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিল। তারা প্রভাবশালী হওয়ার কারণে মামলা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যায় স্থানীয় এক দালাল ভয় দেখিয়ে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকার সামগ্রী নিয়ে যায়। আবদুর রহমান নামের একজন আইনজীবী ছিলেন নির্মল চৌধুরীর ভাড়াটিয়া। ভাড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সাথে মামলাও ছিল। ঘটনার দিন সকাল থেকে তাকে বাড়ির সামনে দেখা যায়। তারই সহযোগিতায় পাকিস্তানিদের মনস্কাম পূর্ণ হয়। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

লালমাটিয়া গণহত্যা : প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিকভাষ্য

মোঃ জহুরউদ্দিন (৮৭)
পিতা: আব্দুল বারী, মাতা: মোমিনা বেগম, গ্রাম: ষাটঘর, ইউনিয়ন: কুচাই, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১০ অক্টোবর ২০১৪

মোঃ জহুরউদ্দিন

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা লালমাটিয়াতে ক্যাম্প করে। তখন আমার বয়স ছিল ৪৩ বছর। আমি স্বাধীনতার পর প্রায় ২৬ বছর ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার ছিলাম। আমার ছোট ভাই ছিলো তৎকালীন সদর উপজেলার থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এবং ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার। তখন আমাদের বাড়ির পিছন থেকে লালমাটিয়া পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প দেখা যেত। পাকিস্তানিরা রেললাইনের দুই পাশে বাঙ্কার করে অবস্থান নেয়। এবং গ্রাম থেকে সাধারণ মানুষকে জোর করে ধরে এনে তাদের ক্যাম্প পাহারা দিতে বাধ্য করত। এই সময়ে ষাটঘরের আব্দুল্লাহ নামে এক রাজাকার পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে হাত মেলায়। এবং সে তাদের রান্না করে দিত। উর্দুতে কথা বলতে পারতো বলে পাকিস্তানিরা তার কথা শোনতো। সে গিতেশ মাস্টার নামে একজন হিন্দু ব্যক্তিকে হিসাবপত্র লেখার কাজে নিয়োজিত করে।

মুক্তিযুদ্ধের শপথ ১৯৭১, শিল্পী: সমরজিৎ রায় চৌধুরী, ১৯৯৩
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

পাকিস্তানি আর্মির ভয়ে আমি সবসময় ফকিরের মতো চলাফেরা করতাম। সবসময় সাথে একটা শার্ট ও প্যান্ট রাখতাম। আমার ভাই যেহেতু আওয়ামী লীগ করতো তাই পাকিস্তানিরা তাকে ধরার চেষ্টা করে। তাই আমি ভাইকে মোগলাবাজার পাঠিয়ে দেই। আমার ভাইয়ের বউ রাগ করে বাড়ি থেকে ঘরগাঁও চলে যায়। কিছুদিন পর সে আইয়ূব খানের শিক্ষা মন্ত্রী জসিম উদ্দিন উকিলের বাড়ি আশ্রয় নেয়। মন্ত্রী আমাকে খবর পাঠান যাতে ভাইকে নিয়ে

আমি মন্ত্রীর সাথে দেখা করি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভাইকে নিয়ে গেলে সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করবে। তাই আমি ভাইকে নিয়ে যাইনি। এই জন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাকে গ্রেফতার করতে চেষ্টা করে। তখন আমি মুসলিম লীগের সেক্রেটারি সেকান্দর সোবহান মিয়ার সাহায্যে রক্ষা পাই।

আমি বাড়িতে সবসময় পাকিস্তানি পতাকা উড়াতাম যাতে পাকিস্তানিরা আমাকে পাকিস্তানের সমর্থক মনে করে। বাড়ির বাইরে একটি জঙ্গলে লুকিয়ে পাকিস্তানিদের আসা যাওয়া দেখতাম। অনেক সময় সৈন্যরা আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় আম পেড়ে নিত। কিন্তু বাড়িতে হামলা করেনি। আমি রাজাকার আব্দুল্লাহকে পান-সুপারি দিয়ে খুশি রাখতাম যাতে পকিস্তানি সৈন্যকে সে আমার বাড়িতে আসতে না দেয়। আব্দুল্লাহ রাজাকার জমির লোভে পাকিস্তানিদের সাহায্য করে। লালমাটিয়ার পাশে আব্দুল্লাহর কিছু জায়গা ছিল। তার পাশে কয়েকজন হিন্দু ব্যক্তির জায়গা ছিল। সেই জায়গার প্রতি আব্দুল্লাহর নজর ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের সাহায্য করে সেই জমি সে দখল করার জন্য কাজ করে। সে সৈন্যদের বোঝায় আমি যদি রাজি থাকি তবে সে এই জায়গা পেয়ে যাবে। কারণ আমি তখন গ্রামের মুরব্বি হিসেবে বিচার সালিশ করতাম এবং সবাই আমার কথা মান্য করত। তাই আমি যদি সে জায়গা আব্দুল্লাহকে দিতে বলি তবে আমার কথা সবাই মেনে নিবে।

জোয়াদ নামে একজন তখন রাজাকার হিসেবে পাকিস্তানিকে সাহায্য করে। সে পাকিস্তানি সৈন্যকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসে। সৈন্যরা বলে যায় আমি যাতে ক্যাম্পে দিয়ে তাদের সাথে দেখা করি। তারা আমার হাতে একটি নামের তালিকা দিয়ে যায় যারা ক্যাম্পে দেখা করবে। সেই তালিকায় আমার নামও ছিল।

পাকিস্তানি সৈন্যরা শিববাড়ির আশে পাশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই লুটপাট করে। সিলেট শহর থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ফিশারির লাল জীপে করে মানুষ ধরে নিয়ে আসত। তাদের সকলের চোখ এবং হাত পিছনে বাঁধা থকতো। তাদের নিয়ে আসার পর মাথার পিছনে গুলি করে লাথি মেরে গর্তে ফেলে দেয়া হতো। অনেক সময় যাদের ধরে নিয়ে আসতো তাদের দিয়ে গর্ত খুড়াতো এবং সেই গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করত। এবং তাদের মাটিচাপা দেয়ার জন্য সকালে কৃষি কাজের জন্য মাঠে আসা মানুষকে ডেকে আনতো। না আসলে তাদেরকেও গুলি করার হুমকি দিতো। তাই কৃষকরা এসে তাড়াতাড়ি লাশ মাটিচাপা দিয়ে চলে যেত।

অনেক সময় এমনও হয়েছে যে গুলি করার পরও মারা যায়নি। কিন্তু কিছুই করার ছিল না। কারণ তাদের পিছনে পাকিস্তানি সৈন্যরা বন্দুক হাতে নিয়ে দাড়িয়ে থাকতো। তাই গুলিবিদ্ধ লোক জীবিত জানা সত্বেও অনেককে জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে দেয়া হতো। তিনি বলেন, আমরা বাড়ির পিছনে থেকে লুকিয়ে দেখতাম কিভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। শহর থেকে মানুষ নিয়ে আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তবে ফিশারির লাল জীপ আসলেই এলাকার মানুষ বুঝে যেতো যে যাদের নিয়ে এসেছে তাদের হত্যা করা হবে। নিজের জীবনের ভয়ে কেউই কাছে যেতে পারতো না। এজন্য লালমাটিয়া বধ্যভূমিতে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের কোন পরিচয় জানা যায়নি।

সিলেট শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের ধরে নিয়ে আসা হতো। প্রায় প্রতিদিন জীপে করে ৫-৬ জন মানুষ নিয়ে আসা হতো। কোনো কোনো দিন ১০-১২ জনও নিয়ে আসতো। তিনি বলেন, গুলির শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারতাম যে কয়জনকে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা বাড়ির পিছনের বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলি করার দৃশ্য দেখতাম।

তখন শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন কুচাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান চাঁন মিয়া। সেক্রেটারি ছিলেন আলম মিয়া। তাদের সাথে রইদ খা নামে একজন পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তা করেন। একদিন শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের হাতে একটি তালিকা দিয়ে সৈন্যরা লালমাটিয়া ব্রিজের কাছে তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের পরের দিন আসতে বলে। পরের দিন তালিকায় যাদের নাম ছিল তারা ক্যাম্পে দেখা করতে গেলে আমাকে ও তোতামিয়াকে ক্যাম্পের বাইরে একটি ব্রেঞ্চে বসিয়ে রাখে। আমাদের বলা হয় আব্দুল্লাহর জায়গার পাশে বীরেন বাবু ও শেখরের বাবার যে জায়গা আছে তা আব্দুল্লাহকে দিয়ে দিতে। আমরা এতে রাজী হয়ে যাই। আমাদের সাথে অন্য যাদের নিয়ে যায় তাদের মধ্যে ছিলেন মোবাশ্বির, বেভুল, আমিরউদ্দিন, আব্দুর নূরসহ কয়েকজন। এদের সবাইকে খুব নির্যাতন করা হয়। আজিজ খা, আবদুর নূর ও বেভুলকে সৈন্যরা সার্কিট হাউসে নিয়ে যায়। এরপর মন্ত্রী জসিমউদ্দিনের সহায়তায় বিকেল ৫টায় তাদের ছাড়িয়ে আনি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহর বয়স ছিল ৪০ বছর। সে তার মামাতো ভাই সৈয়দুল্লাহর বাড়িও লুট করে। সৈন্যরা বড় বড় বাড়ি দেখে লুট করতো। স্বাধীনতা লাভের পর আব্দুল্লাহ জৈন্তাপুর চলে যায়। এবং দেশ স্বাধীনের কয়েক মাস পরে মারা যায়।

মোঃ লাল মিয়া (৬৫)
পিতা: মৃত মোহাম্মদ আলী, মাতা: মলিকা বিবি, গ্রাম: ষাটঘর, ইউনিয়ন: কুচাই, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শিববাড়ি বাজার, ১০ অক্টোবর ২০১৪

মোঃ লাল মিয়া

লালমাটিয়া গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী গোটাটিকরের ষাট ঘরের বাসিন্দা লাল মিয়া। পেশায় তিনি একজন ড্রাইভার। ১৯৭১ সালে তিনি একটি জীপ চালাতেন। তার ২ ছেলে এবং ২ মেয়ে। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ১৯ বছরের যুবক এবং লালমাটিয়া গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী :

এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি সৈন্য সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ রোডে শিববাড়ি থেকে কিছু দূরে লালমাটিয়াতে ক্যাম্প স্থাপন করে। জোয়াদ মিয়ার গাড়িতে পাকিস্তানি ফাইটার শেল নিক্ষেপ করলে সেখানে ২ জন নিহত হন। এরপর পাকিস্তানিরা সিলেট শহর হতে কিছু দূরে এই নির্জন স্থানে রেললাইনের পাশে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। পাকিস্তানিরা সেই পুড়ে যাওয়া বাসটিকে ধাক্কা দিয়ে রেললাইন এবং মূল রাস্তার মধ্যেখানে ফেলে এর ভিতর তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। রাস্তার দুই পাশেই তাদের ক্যাম্প ছিল। তবে শহর থেকে যাদের ধরে আনা হতো তাদের সবাইকে রাস্তার ডান পাশে অর্থাৎ রাস্তার পশ্চিম পাশে গুলি করে গর্তের মধ্যে মাটিচাপা দেওয়া হতো। প্রায় ১ মাইল জায়গা জুড়ে এই বধ্যভূমিটি বিস্তৃত।

পাকিস্তানি সৈন্যরা এপ্রিল মাসে এই ক্যাম্প স্থাপন করে। সৈন্যরা ক্যাম্প পাহারা দেবার জন্য গ্রামের মানুষকে বাধ্য করতো। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান চাঁন মিয়া গ্রামের মানুষের মধ্যে থেকে ঠিক করে দিতেন কারা ক্যাম্প পাহারা দিবে। তারা কয়েকটি পর্যায়ে ১০ জন করে ক্যাম্প পাহারা দিতো। পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে বাঙ্কারের ভিতরে থাকতো। যারা পাহারা

শাঁখারী বাজারে গণহত্যা
শিল্পী হাশেম খানের ড্রইং, ২০১২

দিতো তাদের সৈন্যরা নির্দেশ দিতো যাতে তারা একসাথে পাহারা না দেয়। সবাই যাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তাতে মুক্তিযোদ্ধারা হামলা করলেও তাদের খুববেশি ক্ষতি হবে না।

দেখেছি পাকিস্তানি সৈন্যরা শহর থেকে মানুষকে হাত ও চোখ বেঁধে ফিশারির লাল জীপে করে নিয়ে আসতো। তাই লাল জীপ দেখলেই আমরা বুঝতে পারতাম যে এদের হত্যা করা হবে। পাকিস্তানিদের ভয়ে আমি নিজেও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে বাড়ি ঘর দেখার জন্য আসতাম।

একদিন আমাকেসহ অন্যান্য কয়েকজনকে বাধ্য করে পাকিস্তানিরা লাশ মাটিচাপা দিতে। সেই দিনের কথা ভুলতে পারি না। কারণ সেই দিন একজন জীবন্ত মানুষকে আমি মাটিচাপা দিয়েছি। অন্য একদিনের বর্ণনা দিয়ে বলেন, সেদিন পাকিস্তানি সৈন্যরা আপন দুই ভাইকে ধরে আনে। তাদের দিয়ে গর্ত করায়। এরপর দুই ভাইকে গেঞ্জি দিয়ে চোখ বেঁধে দেয়। এক ভাই অন্য ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। সেই অবস্থাতেই তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি লাশ মাটিচাপা দিয়ে চলে আসি। এরপর আর কখনো এই পথ দিয়ে যাইনি। সেখানে থাকার মতো সাহস আমাদের ছিল না। সবাই বাধ্য হয়ে যেতাম এবং কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতাম। প্রায় প্রতিদিন জীপে করে ৫-৬ জন মানুষ নিয়ে আসা হতো। এবং গুলির শব্দ শুনে আমরা বুঝতে পারতাম যে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭১ স্মরণে, শিল্পী: সৈয়দ জাহাঙ্গীর
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

বোরহান উদ্দিন (৭৬)
পিতা: মৃত সুনাফর আলী, মাতা: তোরাবান বিবি, গ্রাম: ২৭ নং বন্দরঘাট ওয়ার্ড, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শিববাড়ি বাজার, ১০ অক্টোবর ২০১৪

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি পাকিস্তান তিব্বত কোম্পানিতে চাকরি করতাম। আমার ১ ছেলে ও ৫ মেয়ে।

বোরহান উদ্দিন

লালমাটিয়ার পূর্ব নাম ছিল সাধুর কোনা মোড়া। এখানে ব্রিজের কিছু আগে পাকিস্তানিরা ক্যাম্প তৈরি করে। পাকিস্তানিরা শহর থেকে মানুষ এনে এখানে হত্যা করতো। এরপর এলাকার লোকদের ডেকে তাদের মাটিচাপা দেবার ব্যবস্থা করা হতো। এপ্রিলের প্রথম দিকে পাকিস্তানিদের ভয়ে আমরা পালিয়ে জালালপুর মামার বাড়িতে চলে যাই। অন্যান্যদের মতো আমিও মাঝে মাঝে নিজের বাড়ি দেখতে আসতাম। যখন বাড়িতে আসতাম তখন আমি পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যার দৃশ্য দেখতাম। লালমাটিয়া ক্যাম্পে গণহত্যার সাথে সাথে কয়েকজন নারীকেও ধর্ষণ করা হয়। বিশেষ করে যারা তাদের ফেলে যাওয়া বাড়ি দেখতে আসতেন তাদের সাথে কোনো নারী থাকলে তাদেরকে জোর করে ধরে ক্যাম্পে আটকে নির্যাতন করা হতো। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এই ক্যাম্প উঠে যায়।

২৬ শে মার্চের সকাল, শিল্পী: আব্দুর রাজ্জাক

আবুল হোসেন (৫৫)

পিতা: মৃত আব্দুল ওয়াব, মাতা: মোছা. জয়তুন নেসা, গ্রাম: ষাটঘর, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শিববাড়ি বাজার, ১০ অক্টোবর ২০১৪

যুদ্ধের সময় আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। বর্তমানে আমি একটি মোদি [মুদি] দোকান পরিচালনা করি। ষাটঘর মসজিদের পিছন থেকে আমরা লালমাটিয়ায় যে মানুষ মারা হতো তা দেখতাম। যারা জমি চাষ করতে যেতো তাদের দিয়ে জোর করে লাশ মাটিচাপা দেয়া হতো। আমার বাবাকেও পাকিস্তানিরা ধরে লালমাটিয়া ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে গুলি করার জন্য মাথায় বন্দুক ধরে, হঠাৎ করে বন্দুক সরিয়ে তাকে ডাব নিয়ে আসতে বলে। তিনি যখন বাড়ির দিকে আসছিলেন তখন আমরা মনে করেছিলাম যে তাকে হয়তো পিছন দিক থেকে গুলি করে মারার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু না; তিনি বাড়ি পর্যন্ত চলে আসেন।

আবুল হোসেন

তিনি বাড়ি এসে শুধু ডাব উচ্চারণ করেন। সাথে সাথে আমি নারিকেল গাছে উঠে ৩ ভির নারিকেল কাটি। আমি সেই নারিকেল নিয়ে ক্যাম্পে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা তাতে রাজী হননি। তিনি বলেন, 'মরলে আমিই মরব। তোর যাওয়া লাগবে না।' পাকিস্তানিরা নারিকেল পেয়ে বাবাকে ছেড়ে দেয়। আমি নিজে কয়েকদিন দেখেছি কিভাবে লালমাটিয়া ক্যাম্পের পশ্চিম পাশে রাস্তার ডান পাশে মানুষ ধরে এনে গর্তের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

একাত্তরের স্মৃতি, শিল্পী: মনসুর উল করিম
সংগ্রহ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

জোনাব আলী (৬৫)

পিতা: আছদ্দর আলী, মাতা: মোছা. মকলু বিবি, গ্রাম: কিষণপুর, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: শিববাড়ি বাজার, ১০ অক্টোবর ২০১৪

লালমাটিয়াতে পাকিস্তানিরা প্রায় এক হাজার লোককে হত্যা করেছে। আমি নিজে ৪০-৫০ জনকে হত্যা করতে দেখেছি। একেক গর্তে ৬-৭ জন করে কবর দেয়া হয়। রাস্তার পশ্চিম পাশে রেললাইনের ধারে তাদের কবর দেয়া হয়। আমি যখন মাছ ধরে নিয়ে আসতাম তখন আমার অর্ধেক মাছ ক্যাম্পের আর্মিরা নিয়ে যেত। তাদের সাথে থাকতো রাজাকার নামোয়ার খা যার ডাক নাম ছিল নেকু। কিন্তু তাদের বাধা দেওয়া যেত না। আমি নিজে কয়েকদিন মাছ ধরতে গেলে পাকিস্তানি সৈন্যরা জোর করে আমাকে লাশ মাটিচাপা দিতে বাধ্য করে।

জোনাব আলী

লালমাটিয়া গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী (বাঁ থেকে) বোরহান উদ্দিন, আবুল হোসেন, লাল মিয়া, মো: আব্দুল আহাদ ও জোনাব আলী

জৈনপুর গণহত্যা : প্রত্যক্ষদর্শী ও শহীদ পরিবারের মৌখিকভাষ্য

দক্ষিণ সুরমা উপজেলার জৈনপুর গ্রামে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা কয়েক জনকে গুলি করে হত্যা করে। তাদের মধ্যে ৪ জনের নাম পরিচয় জানা যায়। গণহত্যা সংঘটনের দিন সৈন্যরা প্রথমে জৈনপুর দারোগা বাড়ির অমিয়াংশু দেব চিনুকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন তাকে সাথে করে নিয়ে এসে জৈনপুর গ্রামে হিন্দু বাড়িগুলোতে তল্লাশি চালায়। যুদ্ধ শুরু হলে অনেকেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা অমিয়াংশু দেবসহ আরোও ৩ জনকে ধরে গুলি করে হত্যা করে। তাদের সেই হত্যার স্থানটি জৈনপুর গণহত্যার স্থান নামে পরিচিত। যে চারজনকে সেখানে হত্যা করা হয় তারা হলেন– অমিয়াংশু রঞ্জন দেব (চিনু), রসিক চন্দ্র দেব, প্রমোদ চন্দ্র দেব, কৈলাস চন্দ্র দেব। নিম্নে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

রবীন্দ্র কুমার দেব (৬০)
পিতা: স্বর্গীয় রসময় দেব, মাতা: স্বর্গীয় সাবিত্রী দেব, গ্রাম: জৈনপুর, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১০ অক্টোবর ২০১৪। সাক্ষাৎকারে তিনি শহীদ অমিয়াংশু রঞ্জন দেব সম্পর্কে আলোকপাত করেন:

রবীন্দ্র কুমার দেব
(শহীদ অমিয়াংশু রঞ্জন দেব-এর ভাতিজা)

অমিয়াংশু রঞ্জন দেব (চিনু)
সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার ২নং বরইকান্দি ইউনিয়নের বাসিন্দা অমিয়াংশু রঞ্জন দেব (চিনু)-কে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর পিতার নাম রমেশ রঞ্জন দেব। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর। তিনি পেশায় ছিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। তার স্ত্রী দিপ্তী রানী দেব এবং ৫ ছেলে মেয়ে (২ ছেলে ৩ মেয়ে)। পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু করলে এর প্রভাব সিলেটেও পড়ে। তখন অনেকেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। কিন্তু অমিয়াংশু দেব বাড়িতেই ছিলেন।

অমিয়াংশু দেবের বাড়িটি রমেশ দারোগার বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। তার বাবা ছিলেন প্রাক্তন দারোগা। পাকিস্তানি সৈন্যরা লালমাটিয়াতে ক্যাম্প স্থাপন করার পর তিনিসহ অনেককে ধরে নিয়ে ক্যাম্পে নির্যাতন করে। তাকে ধরে নিয়ে সারারাত ক্যাম্পে নির্যাতন করে পরের দিন সকালে গ্রামে ফিরে আসে। পাকিস্তানি সৈন্যরা বলে তিনি যাতে আরও যারা হিন্দু আছেন তাদের দেখিয়ে দেন। তাকে সাথে নিয়েই গ্রাম থেকে আরও ৩ জনকে ধরে সবাইকে এক সাথে গুলি করে হত্যা করা হয়।

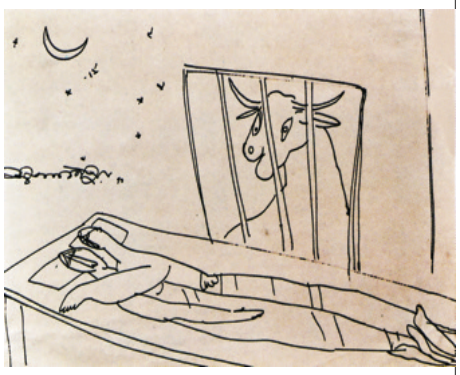

কালো রাত্রির দিন
শিল্পী স্বপন চৌধুরীর ড্রইং, ১৯৭১

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রয়াত যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ির উত্তর পাশে রাস্তায় তাদের ৪ জনকে পাকিস্তানি সৈন্যরা এক লাইনে দাঁড় করায়। লাইনের পিছন থেকে গুলি করে। যোগেশ চন্দ্র

চক্রবর্তী তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যখন পাকিস্তানিরা গুলি করে তখন অন্য ৩ জনের সাথে অমিয়াংশু দেবও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন সবার সামনে। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা সারির পিছন থেকে গুলি করে। গুলি তার শরীরে লাগেনি। তিনি গুলি লাগার ভান করে মাটিতে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানিরা চলে গেছে মনে করে তিনি মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করেন। সেই সময় একজন পাকিস্তানি সৈন্য তাকে জীবিত দেখে ব্রাশফায়ার করে তার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং সাথে সাথেই তার মৃত্যু হয়। কিন্তু কেউ সাহস করে তাদের কাছে যেতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের হাড় ও মাথার খুলি পাওয়া যায়। কিন্তু সেই লাশের কোনো সৎকার করা হয়নি।

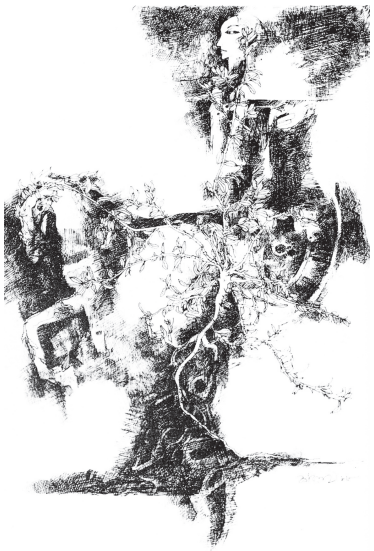

গণহত্যা ১৯৭১,
শিল্পী বীরেন সোমের ড্রইং, ১৯৮৮

রাণা প্রতাপ দেব (৭০)

পিতা: হরিশ্চ চন্দ্র দেব, মাতা: জ্ঞানবালা দেব, গ্রাম: জৈনপুর, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ অক্টোবর ২০১৪। সাক্ষাৎকারে তিনি কাকা রসিক চন্দ্র দেবের জীবনী তুলে ধরেন:

রসিক চন্দ্র দেব

জৈনপুর গণহত্যার শহীদদের অন্য একজন হলেন রসিক চন্দ্র দেব। তাঁর পিতার নাম রঘুনাথ দেব এবং মাতা সারদা দেবী। তার স্ত্রী লীলা রানী দেবী। ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। তাঁর ছিল এক ভাই রসময় চন্দ্র দেব এবং তিন বোন মানদা দেব, জ্ঞানদা দেব ও পারুল রাণী দেব। রসিক চন্দ্র দেব ১ ছেলের জনক ছিলেন। তাঁর ছেলে নারায়ণ চন্দ্র বেদ এর তখন বয়স ছিল ১১ বছর। তিনি বর্তমানে পুলিশের উপ-পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত। তাঁর স্ত্রী বিউটি রানী দেব। ১ ছেলে বিজয় দেব এবং ১ মেয়ে বৃষ্টি রানী দেব।

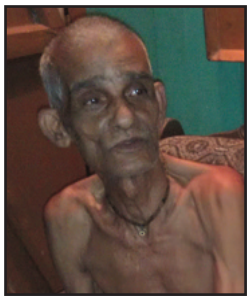

রাণা প্রতাপ দেব
(রসিক চন্দ্র দেব-এর ভাতিজা)

জৈনপুর গণহত্যা এবং তাদেরকে কিভাবে হত্যা করে সে সম্পর্কে রসিক চন্দ্র দেবের ভাতিজা প্রত্যক্ষদর্শী রাণা প্রতাপ দেব

বলেন, ঘটনার দিন সকালে ৯টার দিকে কাকা গরু নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু গরু মাঠে দিয়ে আর ফিরে আসেননি। হঠাৎ করে আমি গুলির শব্দ শুনতে পাই। গুলির শব্দ শুনে বাড়ির বাইরে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি কাকাসহ আরও ৩ জন পিছনে হাতবাঁধা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তিনি বলেন, আমি দূর থেকে দেখি ২ জন রাস্তার উপর এবং ২ জন রাস্তার পাশে জমিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। ঐ স্থানটিতে তখন ধোঁয়া উড়ছিলো। পাকিস্তানি সৈন্যের ভয়ে আমি কাছে যেতে পারিনি। আমি দূর থেকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যাই এবং একটি আম গাছে উঠে নিজের জীবন রক্ষা করি। লাশগুলো তখন সেখানেই পড়ে ছিল। পরবর্তীকালে তাদের কয়েকটি হাড় ও মাথার খুলি পাওয়া যায়।

নারায়ন চন্দ্র দেব (বেচন)
শহীদ রসিক চন্দ্র দেবের একমাত্র সন্তান

গোবিন্দ চন্দ্র দেব (৬৫)
পিতা: প্রমোদ চন্দ্র দেব, গ্রাম: জৈনপুর, থানা: দক্ষিণ সুরমা, জেলা: সিলেট। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ অক্টোবর ২০১৪। শহীদ প্রমোদ চন্দ্র দেবের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র সাক্ষাৎকারে তাঁর পিতার জীবনী তুলে ধরেন:

প্রমোদ চন্দ্র দেব
জৈনপুর গণহত্যার অন্যতম শহীদ প্রমোদ চন্দ্র দেব। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দেব। ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ৭৬ বছর। তিনি ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের জনক ছিলেন। প্রমোদ চন্দ্র দেবের ৩ ভাই ও ১ বোন ছিলেন। সবার বড় ছিলেন কুমুদ চন্দ্র দেব। এরপর প্রমোদ চন্দ্র দেব, অতুল চন্দ্র দেব, পুতুল চন্দ্র দেব এবং বিন্দু রানী দেব। প্রমোদ চন্দ্র দেব এর ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে। পরিমল চন্দ্র দেব (২ ছেলে ৪ মেয়ে), গোবিন্দ চন্দ্র দেব (৪ মেয়ে), গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেব (নিঃসন্তান), গীতা রানী দেব (২ ছেলে ১ মেয়ে) ও ভবানী রানী দেব (২ ছেলে ১ মেয়ে)।

গোবিন্দ চন্দ্র দেব

প্রমোদ চন্দ্র দেবের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র দেব বলেন, আমরা সাত পুরুষ থেকে এই গ্রামে বাস করছি। সেদিন সকাল ১০.৩০ মিনিটের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা দারোগা বাড়ির অমিয়াংশু দেবকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসে। আমার বাবা বাড়ির পিছনে দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশের টিলায় লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে রাজাকারদের সহায়তায় তাঁকে পাকিস্তানিরা ধরে আনে। বারিক মিয়া নামে একজন তাদেরকে বেঁধে নেয়ার জন্য সৈন্যদের রশি এনে দেয়। এরপর অন্যদের সাথে আমার বাবাকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি রাত সাড়ে তিনটার সময় এসে তাদের হাতের বাঁধন কেটে দেই। কারণ তাদের হাত পিছনে বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর আমি আবার পালিয়ে যাই। সেখানেই শিয়াল কুকুর তাদের লাশকে খায়। স্বাধীনতা লাভের পর আমি বাড়িতে এসে সেই স্থান থেকে দুটি মাথার খুলি ও কয়েকটি হাড় এনে আমাদের বাড়ির পিছনে পুকুর পাড়ে মাটিচাপা দিয়ে রাখি। তিনি জানান, পাকিস্তানি হানাদারদের সহায়তা করেন স্থানীয় রাজাকার পাখী মিয়া, কটু মিয়া, হারিছ মিয়া, বারিক মিয়া এবং পাঠান পাড়ার এনাম খান। স্বাধীনতা লাভের পর এদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছিল।

কৈলাস চন্দ্র দেব : ১৯৭১ সালের জৈনপুরের কৈলাস চন্দ্র দেবকে অন্য তিনজনের সাথে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে হত্যা করে। তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর। তিনি ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা। তাঁর ছিল দুই ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলেদের নাম কটু দেব ও কার্তিক দেব এবং মেয়ে ধন দেব। অন্যদের সঙ্গে তাকেও ধরে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ির দক্ষিণ দিকের রাস্তায় নিয়ে আসে। এবং এক সারিতে দাঁড় করে গুলি করে। অন্য সবার সাথে তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং সাথে সাথেই তার মৃত্যু হয়।

জৈনপুর গণহত্যায় শহীদদের তালিকা

ক্রমিক	শহীদের নাম	বয়স	পিতা	মাতা/স্ত্রী	পেশা	সন্তান
১	অমিয়াংশু দেব	৩৫	রমেশ চন্দ্র দেব	দিপ্তী রাণী দেব (স্ত্রী)	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা	২ ছেলে ৩ মেয়ে
২	প্রমোদ চন্দ্র দেব	৭৬	কৃষ্ণ চন্দ্র দেব	জানা যায়নি	চাকরি	৩ ছেলে ২ মেয়ে
৩	রসিক চন্দ্র দেব	৬৫	রঘুনাথ দেব	সারদা দেবী (মাতা) লীলা রাণী দেবী (স্ত্রী)	কৃষিকাজ	১ ছেলে
৪	কৈলাস চন্দ্র দেব	৭০	জানা যায়নি	জানা যায়নি	প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা	২ ছেলে ১ মেয়ে

খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা

সিলেট নয়াসড়কে অবস্থিত খাজাঞ্চি বাড়ি ছিল জমিদার বাড়ি। এই জমিদার বাড়িতে ১৯৭১ সালে যে গণহত্যা সংঘটিত হয় তা খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা নামে পরিচিত। এই জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। খাজাঞ্চি বাড়ির জমিদারদের মূল বাড়ি ছিল হবিগঞ্জের বানিয়াচং। তারা খাজনা আদায় করতেন বলে এই বাড়ির নাম হয় খাজাঞ্চি বাড়ি।

বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী ১৯৩৬ সালে তাঁর জমিদারি রাধামাধব জিউর নামে উইল করে তা দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিণত করেন। বর্তমানে খাজাঞ্চি বাড়ির সমুদয় সম্পত্তি উইলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সেই উইলে সম্পত্তির হিসাবের পাশাপাশি দেবতার পূজোর জন্য যে তৈজসপত্র ব্যবহার হয় তারও হিসাব লিপিবদ্ধ আছে। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সরকার বাড়িটি রিকুইজিশন করে ইপিআর ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে। খাজাঞ্চি বাড়ির শেষ জমিদার নির্মল চৌধুরী। তার পিতা নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী। নির্মল চৌধুরী বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পিসাতো ভাই। বর্তমানে খাজাঞ্চি বাড়ির একাংশে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত।

বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীর ছিলেন ৪ ছেলে। তারা হলেন– বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, লোকেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মনিন্দ্র চক্রবর্তী এবং ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৪ ছেলে। বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই মারা যান। পাকিস্তানিরা প্রভাবতী দেবী এবং বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ৩ ছেলে বিমলানাথ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীকে হত্যা করে। অন্য ছেলে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী গুলি খেয়ে গুরুতর অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাদের বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (আত্মীয়) এবং রামডিং গোয়াল (৩৯) নামে এক নেপালি কাজের লোককেও হত্যা করা হয়। বাড়ির পিছনে পুকুর পাড়ে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পুত্রেরা ছিলেন অবিবাহিত। বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় ছেলে লোকেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যুদ্ধের পূর্বে ভারতে চলে যান। তাঁর ছেলে ললিতনাথ চক্রবর্তী। ললিতনাথ চক্রবর্তীর মেয়ে শম্পা চক্রবর্তী বর্তমানে খাজাঞ্চি বাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তৃতীয় ছেলে মনিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভারতে চলে গিয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন নিঃসন্তান। ১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে এবং বাড়ি পুড়িয়ে দেয়।

খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা সম্পর্কে জানা যায় যে, এপ্রিল মাসে লে. ক. মাকসুদ, ফ্লাইট লে. আনসারী এবং সুপারিনটেন্ডেন্ট জালাল পরিকল্পনা করে সিলেটের মালনি ছড়া চা বাগানের মালিক ও ধনাঢ্য ব্যক্তি নির্মল চৌধুরীকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক করে হত্যা করে। ২৯ এপ্রিল তার পরিবারের সদস্যরা সিলেটে আক্রান্ত হন। নির্মল চৌধুরী এপ্রিলের শুরুতে ঢাকায় রাজনীতিক ও সংস্কৃতিসেবী সায়দুল হাসানের বাসায় অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি আনসারী-জালালের ফাঁদে পা দেন। এরপর তিনি তাদের হাতে প্রাণ দেন। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দেন তার বন্ধু বিশিষ্ট শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদ সায়দুল হাসান। তিনি ভাসানীপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

৭ এপ্রিল হাওয়াপাড়ায় একটি গণহত্যা শেষে পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্মল চৌধুরীর বাড়ি আক্রমণ করে। বাড়ির সকলকে একই লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি ছোঁড়ার আগেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও প্রদীপ ছত্রী সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর সৈন্যরা তাদের হত্যা না করে চলে যায়। ২৪ এপ্রিল তারা আবার আসে এবং বাড়ির নেপালি কাজের লোক রামডিং গোয়ালকে হত্যা করে। এর মধ্যে স্থানীয় এক দালাল ভয় দেখিয়ে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকার সামগ্রী নিয়ে যায়। আবদুর রহমান নামের একজন আইনজীবী ছিলেন নির্মল চৌধুরীর ভাড়াটিয়া। ভাড়া সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সাথে মামলাও ছিল। ঘটনার দিন সকাল থেকে তাকে বাড়ির সামনে দেখা যায়। তারই সহযোগিতায় পাকিস্তানিদের অপারেশন সফল হয়। ২৯ এপ্রিল দুপুর বারোটায় পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ে এল সাইজের একটি গর্ত খোঁড়ার নির্দেশ দেয়। তাদের সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়। বিকেল ৪টায় এসে তারা চার ব্রান্ডের একটি রেডিও চায়। কিন্তু চার ব্রান্ডের রেডিও না দিয়ে এক ব্রান্ডের রেডিও দিলে সৈন্যরা তা গ্রহণ করেনি।

রাত সাড়ে আটটায় আবার আসে গুল মোহাম্মদ ও নূর মোহাম্মদ নামের দু'জন পাকিস্তানি সেনা। বাড়ির লোকেরা রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় দরজায় কড়া নাড়া হয়। দরজা খুলে দিতেই সৈন্যরা ঘরে প্রবেশ করে। বাড়ির সকল সদস্যকে একে একে বেঁধে ফেলা হয় এবং তাদেরকে বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ের এল সাইজের গর্তের পাশে নিয়ে আসা হয়। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয় প্রভাবতী দেবী, বিমলনাথ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং দেবেন্দ্র চক্রবর্তীকে। তাদের মধ্যে থেকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় পালাতে সক্ষম হন। বাকি সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং এরপর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের বাড়ি লুট করে লক্ষ লক্ষ টাকার

সম্পদ নিয়ে যায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে যাবার পর আনা মিয়া নামের এক প্রতিবেশী সাহস করে এসে তাদের লাশগুলো মাটিচাপা দেন।

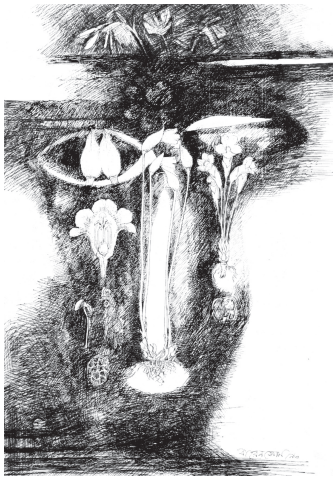

গণহত্যা ১৯৭১, বীরেন সোমের ড্রইং, ১৯৯৩

শম্পা চক্রবর্তী

খাজাঞ্চি বাড়ির উত্তরাধিকারী শম্পা চক্রবর্তী। তিনি খাজাঞ্চি বাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার পিতার নাম লোকেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং মাতা দিপালী চক্রবর্তী। তিনি জানান, খাজাঞ্চি বাড়ির জমিদারদের মূল বাড়ি ছিল হবিগঞ্জের বানিয়াচং। তারা খাজনা আদায় করতেন বলে এই বাড়ির নাম হয় খাজাঞ্চি বাড়ি। এই খাজাঞ্চি বাড়ির জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তী। তিনি তার বাবার নিকট থেকে তাদের বাড়িতে পাকিস্তানিরা যে গণহত্যা চালায় সে সম্পর্কে শোনেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানিরা তাদের বাড়ি সম্পত্তি লুট করার জন্য এই গণহত্যা চালায়। এদের সাথে স্থানীয় কিছু লোক ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে তিনি সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারেননি।

দেবাশীষ সেন (৭১)

পিতা : মৃত রাজকুমার সেন, মাতা : প্রাণলতা সেন, নয়াসড়ক, সিলেট, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১১ অক্টোবর ২০১৪। সাক্ষাৎকারে তিনি খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যার কথা তুলে ধরেন:

দেবাশীষ সেন

খাজাঞ্চি বাড়িতে ছিল ইপিআর ক্যাম্প। তাই সৈন্যরা সেখানেই থাকতো। এর পাশের অংশ ছিল বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীর বংশধরদের। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে এই গণহত্যা ঘটে।

১৯৫৮ সালে খাজাঞ্চি বাড়ি সরকার রিকুজিশন করে নেয়। এই বাড়ি ১৯৫৮-১৯৮৪ সালে পর্যন্ত প্রথমে ইপিআর, এরপর বিডিআর ক্যাম্প ছিল। ১৯৮৭ সালে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে সিলেট শহরে কারফিউ জারি করা হয়। এরপর পাকিস্তানিরা রাস্তায় যত মানুষ পায় তাদের গুলি করে হত্যা করে। ২ দিন পর কারফিউ শিথিল করা হয়। ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। বহু মানুষ শহর ছেড়ে চলে যায়। তিনি জানান, তারা নিজ বাড়িতেই থেকে যান। এপ্রিলের প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনী সিলেটে প্রবেশ করে এবং পাকিস্তানিদের সাথে তাদের গুলি বিনিময় হয়। ২ দিন এই অবস্থা চলে। এরপর পাকিস্তানিরা বাধ্য হয়ে শহর ছেড়ে চলে যায় এবং বিমানবন্দরে অবস্থান নেয়। এমতাবস্থায় ৪-৭ এপ্রিলের মধ্যে সিলেট শহরের সকল মানুষ বিশেষ করে হিন্দুরা বাইরে চলে যায়। কিন্তু খাজাঞ্চি বাড়ির কয়েকজন, দেবাশীষ সেনসহ আশেপাশের কয়েক বাসার লোক বাড়িতেই থেকে যান।

এপ্রিলের ৮ তারিখ তারা জানতে পারেন যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা আবার সিলেট শহরে ফিরে এসেছে। এরপর তারা ঘরে বন্দি হয়ে যান। ২০ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে। পাকিস্তান আর্মির একজন ক্যাপ্টেন তাদের সাহায্য করে এবং বাসার বাইরে বের হতে নিষেধ করে। তার ভরসায় তারা বাসায় থেকে যান। এপ্রিলের শেষের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরা খাজাঞ্চি বাড়িতে এই গণহত্যা চালায়। তিনি বলেন, যেহেতু রাতের বেলা এই গণহত্যা হয়েছে তাই আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব ছিল না। আমাদের প্রতিবেশী নেপালি বলবাহাদুরের কাছ থেকে আমরা খাজাঞ্চি বাড়ির লোকদের হত্যার ঘটনা জানতে পারি।

খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যায় শহীদদের তালিকা

ক্রমিক	শহীদের নাম	বয়স	পিতা/স্বামী	সন্তান
১.	প্রভাবতী দেবী	৫০	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৪ ছেলে
২.	বিমলানাথ চক্রবর্তী	৩০	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	অবিবাহিত
৩.	ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	২৭	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	অবিবাহিত
৪.	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী	২৬	বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	অবিবাহিত
৫.	দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (আত্মীয়)	৬০		
৬.	রামডিং গোয়াল (নেপালি কাজের লোক)	৩৯		

সংরক্ষণের প্রয়াস

দেশের অনেক বধ্যভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতন কেন্দ্রের মতো লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা নিদারুণ উপেক্ষার শিকার হয়েছে। গণহত্যার সংখ্যা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও গণমাধ্যমে তার প্রকাশ প্রত্যাশাস্বরূপ নয়। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পর কয়েকটি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করলেও তার কোনো প্রচার দেখা যায়নি। জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যার ঘটনাকে পারিবারিকভাবে শোকের ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীরা। ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন গণহত্যা জাতীয় ঘটনার গুরুত্ব পেতে শুরু করলেও এই গণহত্যা তেমন নজরে আসেনি।

স্বাধীনতা লাভের ৪৩ বছর পরও সিলেট শহরের এত কাছে লালমাটিয়াতে এই নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমিটি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। স্থানীয় ষাটঘরের বাসিন্দা জামাল মিয়া নামে এক যুবক লালমাটিয়াতে গণহত্যার স্থানে একটি বটগাছ রোপণ করেন এবং প্রতিবছর জাতীয় দিবসে সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বলে সঞ্জয়কান্তি দেব *মাসিক সাগ্নিক* পত্রিকায় উল্লেখ করেন। জামাল মিয়া যুদ্ধের সময় খুবই ছোট ছিলেন। তারপরও তার মনে এই নির্মম গণহত্যা নাড়া দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার এই স্থানটিকে সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

বর্তমান অবস্থা

লালমাটিয়া গণহত্যা: ১৯৭১ সালে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লালমাটিয়াতে শতাধিক এবং কারো কারো মতে সহস্রাধিক লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায় লালমাটিয়ায় গণহত্যার কথাটি তখন ভারতে শরণার্থী শিবিরে থাকা অবস্থায় অনেকে শুনেছেন। কিন্তু এত বড় একটি বধ্যভূমিকে এখনও পর্যন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। লালমাটিয়া গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী গোটাটিকর ষাটঘরের বাসিন্দা জামাল মিয়া। ১৯৭১ সালে তিনি খুব ছোট ছিলেন। কিন্তু হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যা তাকে কষ্ট দিয়েছিল। তাই তিনি গণহত্যার স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখার জন্য একটি বটগাছ রোপণ করেন। এবং প্রতিবছর জাতীয় দিবসে সেই গাছটিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

লালমাটিয়া গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী গোটাটিকর ষাটঘরের বাসিন্দা জামাল মিয়া ও তার রোপণ করা বটগাছ

স্থানীয়রা আক্ষেপ করে বলেন, বেশ কয়েকবার এই স্থানটি পরিদর্শন করে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং উপজেলা থেকে একটি জরিপও পরিচালনা করা হয়েছে। কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অনেকে বর্তমান লেখকের সাথে কথাই বলেতে চাননি। কারণ তারা অনেকবার এ নিয়ে কথা বলেছেন। তাই তারা জোর দাবি জানান যাতে স্বল্প পরিসরে হলেও এই স্থানটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ এই স্থানটিতে বর্তমানে ডেভেলোপার কোম্পানি দালান তৈরি করছে। কিছু দিনপর দেখা যাবে এই স্থানটিও তাদের দখলে চলে গেছে। স্থানীয়রা শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, যত দ্রুত সম্ভব এই স্থানটি সংরক্ষণ করতে হবে। না হলে শহীদদের প্রতি শেষ সম্মান জানানোর জন্যও কিছু করার থাকবে না।

জৈনপুর গণহত্যা: ১৯৭১ সালে জৈনপুর গণহত্যার স্থানটি এখনও সংরক্ষণ করা হয়নি। শহীদ প্রমোদচন্দ্র দেবের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দেব বলেন, আমার বাবা দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। বিনিময়ে আমরা কিছুই চাই না। যে স্থানে তাঁকেসহ ৪ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে সে স্থানটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। তিনি বলেন, তিনি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ তাকে সহায়তা করেননি। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, যদি কেউ কিছু না করেন তবে তিনি নিজ উদ্যোগে একটি ফলক স্থাপন করবেন। সঞ্জয়কান্তি দেব তার নিয়মিত প্রকাশনা *মাসিক সাগ্নিকে* স্থানটির একটি ছবিসহ প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে তিনি বলেন, শহীদ প্রমোদচন্দ্র দেবের পুত্র গোবিন্দ দেব আক্ষেপ করে বলেন, 'দীর্ঘ ৪৩ বছর পরও স্থানটি চিহ্নিত না করায় বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাচ্ছে। কোন দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার দু'টো ইট গেঁথে স্থানটি চিহ্নিত করে দিলে আমরা শহীদ সন্তানগণ দেখে যেতাম শহীদরা সম্মান পেয়েছেন।'

ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে জৈনপুর গণহত্যার স্থানে শহীদ প্রমোদ চন্দ্র দেবের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র দেব

এই স্থানটিতে একটি স্মৃতিফলক থাকলে তাতে শহীদদের নাম থাকবে যা উত্তর প্রজন্ম জানতে পারবে। আর উত্তর প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে হলে এই বধ্যভূমি ও গণকবরগুলো সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। স্থানীয় সুধীজন এই স্থানটিতে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। তাঁদের আবেগ দেখে কথা দিয়ে এসেছিলাম সরকারিভাবে সম্ভব না হলেও 'বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী' সেখানে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবে। এই স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো।

খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যা: খাজাঞ্চি বাড়িতে ২৯ এপ্রিল গণহত্যায় শহীদদের কথা সবাই অবগত হলেও সেখানে এখনও পর্যন্ত কোনো স্মৃতিস্তম্ভ বা ফলক লাগানো হয়নি। খাজাঞ্চি বাড়িতে বর্তমানে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালিত হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। শহীদ পরিবারে একমাত্র উত্তরাধিকারী শম্পা চক্রবর্তী সেখানে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। পাশাপাশি স্থানীয় সুধীজনও একই মত পোষণ করেন।

মূল্যায়ন

লালমাটিয়াতে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অন্তত এক হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। সেখানে হিন্দু, মুসলিম, আওয়ামী লীগ সমর্থকসহ সকল শ্রেণিপেশার লোক ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কারো পক্ষে এই স্থান দিয়ে গেলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, ১৯৭১ সালে এখানে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়িতেও তারা গণহত্যা চালায় তবে তা লালমাটিয়ার মতো পরিকল্পিত ছিল না।

লালমাটিয়া একটি পরিকল্পিত গণহত্যা। দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে যে হঠাৎ করে আক্রমণ করে গণহত্যা সংঘটিত করা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। পাকিস্তানি সৈন্যরা শহর থেকে কিছুটা দূরে নির্জন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা সংঘটিত করে। যাদেরকে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে স্থানীয়রা কেউ চিনত না। শহরের বাইরে এই নির্জন স্থানে তাদের গণহত্যা পরিচালনা করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। লালমাটিয়াতে ক্যাম্প

করে গণহত্যা চালানোর কারণে স্থানীয়দের মাধ্যমে লাশ মাটিচাপা দেওয়া তাদের জন্য সহজ হয়েছে। তাই যাদেরকে তারা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদেরকে হাত পা বেঁধে লালমাটিয়াতে এনে হত্যা করেছে। অনেক সময় হত্যা করার পর লাশও এখানে ফেলে গেছে। এবং কিছু কিছু সময় তারা ক্যাম্পে আটকে নির্যাতনও করেছে।

স্থানীয় যে রাজাকাররা পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তা করেছিল তাদের অনেকেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য আদর্শগত ছিল না, ছিল স্বার্থগত। ষাটঘরের আব্দুল্লাহ রাজাকার ক্যাম্পে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তা করেছিল আশেপাশের হিন্দুদের জমি দখল করার জন্য। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়ে যাচ্ছে এবং তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে সে ধারণা থেকে সে পাকিস্তানিদের সাহায্য করেনি। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্যের সম্পত্তি দখল করা।

জৈনপুর গণহত্যায় যে স্থানীয় রাজাকাররা পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তা করেছিল তাদেরও উদ্দেশ্য ছিল সম্পত্তি দখল এবং পাকিস্তানিদের খুশি করা। আবার খাজাঞ্চি বাড়ি গণহত্যায় স্থানীয় রাজাকাররা সম্পদ লুট করার জন্যই পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে।

গণহত্যায় সহায়তা করার জন্য পূর্বশত্রুতাও কারণ হিসেবে কাজ করেছে। নির্মল চৌধুরীর সাথে তার ভাড়াটিয়ার ভাড়া নিয়ে মামলা চলছিলো। নির্মল চৌধুরীর সেই ভাড়াটিয়া পাকিস্তানি সৈন্যদের সাহায্য করেছে। এই গণহত্যার ক্ষেত্রে সম্পদের চেয়ে পূর্বশত্রুতা বেশি কাজ করেছে।

গণহত্যার এই বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি যে বিষয়টা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তা হলো জামাল মিয়ার মতো একজন সাধারণ মানুষের মনে গণহত্যার প্রভাব। জামাল মিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় ছোট ছিলেন। কিন্তু সেই ভয়াবহ গণহত্যা তার মনকে আলোড়িত করেছিল। তাই তিনি গণহত্যার স্থানটিতে একটি বটগাছ রোপণ করে সেই বটগাছে জাতীয় দিবসগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা অচিহ্নিত বধ্যভূমি ও গণকবরগুলো যদি চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা যায় তবে শহীদদের আত্মা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা কিছুটা হলেও শান্তি পাবেন। শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলে এই লেখকের অন্তত তাই মনে হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে গণহত্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

সঞ্জয় কান্তি দেব, *বিস্মৃতির আড়ালে সিলেটের গণহত্যা*, শিবানী-মাধুরী কল্যাণ ট্রাস্ট, সিলেট, ২০১৪

তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১

শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *সিলেট ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৯

সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

অপূর্ব শর্মা, *সিলেটে যুদ্ধাপরাধ ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

মইন উদ্দিন আহমদ ও দীপঙ্কর মোহান্ত (সম্পা.), *শহীদ সুলেমান হোসেন স্মারক গ্রন্থ*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২

সঞ্জয় কান্তি দেব (সম্পা.), *মাসিক সাগ্নিক*, আগস্ট ২০১৪

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস*, ঢাকা ২০০৬

সাক্ষাৎকার

জহুরউদ্দিন, ষাটঘর, গোটাটিকর
লাল মিয়া, ষাটঘর, গোটাটিকর
বোরহান উদ্দিন, বন্দর ঘাট, গোটাটিকর
আবুল হোসেন, ষাটঘর, গোটাটিকর
মো: আব্দুল আহাদ, ষাট ঘর, গোটাটিকর
জোনাব আলী, কিষণপুর
মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ মিয়া, ষাট ঘর, গোটাটিকর
বীরেন্দ্র কুমার দেব (আশীষ), জৈনপুর
নারায়ণ চন্দ্র দেব, জৈনপুর
রাণা প্রতাপ দেব, জৈনপুর
গোবিন্দ চন্দ্র দেব, জৈনপুর
অ্যাডভোকেট দেবাশীষ সেন, নয়াসড়ক
অসিত ভট্টাচার্য্য, নয়াসড়ক
শম্পা ভট্টাচার্য্য, খাজাঞ্চি বাড়ি, নয়াসড়ক
অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য, নাইওরপুল

ঋণস্বীকার

সঞ্জয় কান্তি দেব, সম্পাদক, মাসিক সাগ্নিক
বীরেন্দ্র কুমার দেব (আশীষ), গ্রাম: জৈনপুর, শিববাড়ি, দক্ষিণ সুরমা
অসীম কুমার দেব, গ্রাম: জৈনপুর, শিববাড়ি, দক্ষিণ সুরমা
লাল মিয়া, ড্রাইভার, গ্রাম: ষাটঘর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট
মইন উদ্দিন আহমদ, লামাবাজার, সিলেট
আবুল কাসেম, প্রভাষক, মদনমোহন কলেজ
অ্যাডভোকেট দেবাশীষ সেন, নয়াসড়ক, সিলেট
অসিত ভট্টাচার্য্য, নয়াসড়ক, সিলেট
শম্পা ভট্টাচার্য্য, খাজাঞ্চি বাড়ি, নয়াসড়ক, সিলেট
অ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য্য, নাইওরপুল, সিলেট

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা

দামেরখণ্ড গণহত্যা	সত্যজিৎ রায় মজুমদার
লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চিবাড়ি গণহত্যা	তপন পালিত
মুজাফরাবাদ গণহত্যা	চৌধুরী শহীদ কাদের
বেলতলী গণহত্যা	মামুন সিদ্দিকী
কালিগঞ্জ গণহত্যা	আহম্মেদ শরীফ
বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা	শান্তা পত্রনবীশ
কাঠিরা গণহত্যা	হিমু অধিকারী
বাদামতলা গণহত্যা	গৌরাঙ্গ নন্দী
গোলাহাট গণহত্যা	আহম্মেদ শরীফ
পাহাড়তলী গণহত্যা	চৌধুরী শহীদ কাদের
চুকনগর গণহত্যা	মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত

* বিজয় দিবস ২০১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত